এরশাদের একটি পুরানো সাক্ষাৎকার এবং রাজনীতির কক্ষপথ

আ হ সা ন মো হা ম্ম দ

পঁচিশ বছর আগে, ১৯৮২ সালের ১৬ই এপ্রিল সাপ্তাহিক বিচিত্রা তৎকালীন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের একটি দীর্ঘ ও একান্ত সাক্ষৎকার প্রকাশ করে। সাক্ষাৎকারটি যখন নেয়া হয়, তখন তার সামরিক সরকারের বয়স ছিল মাত্র তিন সপ্তাহ। যেহেতু অনেকটা সেই রকম একটি সময়ের মধ্য দিয়ে জাতি অতিক্রান্ত হচ্ছে, তাই সাক্ষাৎকারটিকে পাঠকগণের নিকট গুরুত্বপূর্ণ মনে হতে পারে। সাক্ষাৎকারটিতে সে সময়ের ক্ষমতাশীনদের বক্তব্য, যুক্তি, প্রতিশ্রুতি ইত্যাদির সাথে বর্তমানের ক্ষমতাশীনদের বক্তব্য মিলিয়ে দেখলে এবং তার পরবর্তী ঘটনাবলীকে বিশ্লেষণ করলে সামনের দিনগুলোতে বাংলাদেশ কোন দিকে যাচ্ছে তারও একটি ধারণা পাওয়া যেতে পারে। পাঠকগণ সে সময়কার মিডিয়ার ভূমিকার সাথে বর্তমানের অবস্থাও মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করতে পারেন। নীচে সাক্ষাৎকারটির অংশ বিশেষ তুলে ধরা হলো। এটি গ্রহণ করেছিলেন শাহাদত চৌধুরী।

প্রথম প্রশ্ন ছিল, 'সামরিক আইন জারির সময় আপনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। এ ব্যাপারে কি ধরণের পদক্ষেপ নিচ্ছেন?'

জবাবে এরশাদ বলেছিলেন, 'দেশে এমন এক সময় সামরিক আইন জারি করা হয়েছে যখন দুর্নীতি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে ব্যাপকভাবে, জাতীয় অর্থনীতি হয়েছে বিধ্বস্ত, সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে এসেছে চরম দুর্দশা, তাদের অর্থনৈতিক মুক্তি হয়েছে সুদূর পরাহত। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভ্রান্ত নীতি গ্রহণ, দক্ষ পরিচালনার অভাব, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের মধ্যকার ব্যবধান বাড়িয়ে তুলেছে। কল-কারখানা, ব্যাংক, অফিস-আদালত, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানার চরম অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি এবং লুটতরাজ চলছিল বাধাহীন গতিতে। এই অবস্থার আশু অবসান প্রয়োজন। তাই দুর্নীতিকে আমরা এক নম্বর শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করেছি। যেখানেই দুর্নীতি এবং অব্যবস্থাপনা সেখানেই আঘাত হানা হবে। এই আঘাত কারো বিরুদ্ধে উইচ হান্টিং নয়। ইতিমধ্যে নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে কয়েকজন সাবেক মন্ত্রী, আমলা ও ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাদের বিরুদ্ধে সামরিক বিধি অনুযায়ী কঠোর শাস্তি দিতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। দুর্নীতি আরো অনেকেই করেছেন। তাদের সবাইকে বিধি অনুযায়ী শাস্তি পেতে হবে। জনগণের অর্থ নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলেছে, ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে যারা শোধ করেনি, উৎপাদনশীল খাতে ঋণ নিয়ে তা বিলাসী জীবন যাপনে ব্যয় করেছে (যার পরিণতিতে জাতীয় অর্থনীতিতে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে) জাতীয় স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে এদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে। সমাজ থেকে দুর্নীতি উচ্ছদ করতে হবে। তা না হলে জাতীয় জীবনে অগ্রগতি আসবে না। সে কারণেই আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছি।'

আরেকটি প্রশ্ন ছিল, 'রাষ্ট্র পরিচালনায় সেনাবাহিনীর ভূমিকা কি হবে ?'

উত্তরঃ- 'রাষ্ট্র পরিচালনায় সেনাবাহিনীর ভূমিকার প্রশ্নটিকে আমাদের জাতীয় বাস্তবতার আলোকে বিচার করতে হবে। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী পূর্বের মত উপনিবেশিক সেনাবাহিনী নয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে, আমাদের স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্বের সঙ্গে এই সেনাবাহিনী জড়িত। উপরন্তু সেনাবাহিনীর সদস্যরা দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী থেকে আগত। স্বাভাবিকভাবে চিন্তার জগতে এরা জাতীয় আশা-আকাঙ্খা ও ঘটনা প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। এ কারণেই অতীতে বিভিন্ন সময়ে সেনাবাহিনী জাতীয় প্রয়োজনে তার যথাযথ ভূমিকা পালন করেছে। তাই সেনাবাহিনীকে বিভিন্ন জাতীয় কার্যক্রম থেকে দূরে রাখা যুক্তিসঙ্গত হবে না। আমি মনে করি রাষ্ট্র পরিচালনায় সেনাবাহিনী সহযোগী ভূমিকা পালন করেব। যেখানে বিভিন্ন উন্নয়ন কাজে, প্রশাসনে সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণ হবে প্রাতিষ্ঠানিক। সেনাবাহিনী অবশ্যই সরাসরি রাজনীতির অংশীদার হবে না, কিন্তু জনবিরোধী রাজনীতিকে সমর্থনও করবে না।'

প্রশ্নঃ - বিচারপতি সাত্তারের নির্বাচনে আপনি মূখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। এ বাস্তবতাকে মেনে নিলে সেনাবাহিনীর ক্ষমতা গ্রহণকে কিভাবে বিচার করা হবে?

উত্তরঃ- 'এ প্রশ্নকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। আমি একজন সৈনিক। বর্তমানে যে দায়িত্ব পালন করছি তার জন্য আমাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়। আমি সেনাবাহিনীকে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত করতে চাইনি। চেয়েছিলাম, ক্ষমতাশীন সরকারই দায়িত্ব পালন করে যাক। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে শাসনতন্ত্র তৈরি হয়েছিল এক ব্যক্তির জন্যে এবং সে ব্যক্তিই ছিলেন অনুপস্থিত। যাঁকে সেই শুন্য আসনে বসানো হবে তাকে সে ধরণের ব্যক্তি হতে হবে। কিন্তু তিনি তেমন ছিলেন না। আমাদের সে সময় তেমন লোকও ছিল না। তিনি সম্মানীয় ব্যক্তি হলেও, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলেন না। তার উচিত ছিল, মন্ত্রী পরিষদকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা।

আমি ইচ্ছাকৃতভাবে এ দায়িত্ব নেইনি। আমি আমার জওয়ান ও অফিসারদের বলে দিয়েছি, অতীতে এ সেনাবাহিনী অনেক ভুল করেছে। কিন্তু এখন সময় এসেছে, ইতিহাসে অবদান রাখার, ঐতিহ্য সৃষ্টির। আমরা ক্ষমতা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। আবার সুষ্ঠুভাবে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিয়ে চলে যাব। তার জন্য প্রয়োজন হবে নতুন শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, গণতন্ত্র সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন।'

প্রশ্নঃ- কিন্তু শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত না হলে কি সেনাবাহিনী ক্ষমতা ছেড়ে দেবে?

উত্তরঃ - 'সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণ নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। আমার মনে হয়, এটা ঠিক অংশগ্রহণ নয়, অংশগ্রহণের মানসিকতা। যেমন, আজকে সেনাবাহিনীর যে জওয়ানরা রয়েছে, তার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তারা রক্ত দিয়েছে নিজেদের পছন্দ মোতাবেক রাষ্ট্র কায়েমের জন্য। যেখানে সুখী সুন্দর সমাজ কায়েম হবে; কিন্তু তারা যখন দেখে এ স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি, তখনই তা তাদের আশাভঙ্গের কারণ হয়। হতাশা থেকে বিদ্রোহ করতে চায়। তাই আপনারা তাদের সঙ্গে নেন। বলেন, রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদের সৎ পরামর্শ গ্রহণ করা হবে। ভালো না হলে তার দায়িত্বও আমরা গ্রহণ করবো। তাছাড়া আমরা একটি সংগঠিত শক্তি। যে কোন অসামরিক কাজে আমরা সাহায্য করতে পারি। তাতে আমার জওয়ানরা গর্ববোধ করেব - জাতীয় নির্মানের অংশীদার হতে পারবে। আমরা জনগণেরই অংশ। এতে বর্তমানে যে দূরত্ব রয়েছে তা দূর হবে। এ দূরত্ব থাকলে আমরা যে এক জাতি তা কখনো

প্রতিষ্ঠিত হবে না। আমি জাতির কাছে যে অঙ্গীকার করেছি তা যথাসময়ে পূরণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব। তারপর আমি আমার স্থানে ফিরে যাব। আমার নিয়তি কি হবে তা আমি জানি না। কিন্তু এ আসনে বসে, এ পোষাকে আমি রাজনীতি করবো না, আমার প্রতিষ্ঠানকে হেয় করবো না। আমি অনেকের মতোই উচ্চাভিলাষী নই। ত্রিশ বছর ধরে আমি সেনাবাহিনী প্রধান হওয়ার জন্য কাজ করেছি, অন্য কিছুর জন্য নয়।'

প্রশ্ন - সাধারণ নির্বাচন কবে দেবেন ? সময় কি অনুমান করা যায় ?

উত্তরঃ - 'সাধারণ নির্বাচন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একটি উপাদান। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি আমার শ্রদ্ধার প্রমাণ অতীতে পেয়েছেন। সামরিক আইন জারি করে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া প্রথম ভাষণেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি আমার আস্থার কথা বলেছি। পরিস্থিতি জনগণের স্বার্থের অনুকূল হলেই সাধারণ নির্বাচন দেয়া হবে। এ জন্য দুবছর কিংবা তার বেশি সময় দরকার হতে পারে, কিন্তু অনুমান করাটা বড় কথা নয়।'

সামরিক শাসক এরশাদের সাক্ষাৎকারটি পড়লে কয়েকটি বিষয় দিকালোকের মত স্পষ্ট হয়ে ওঠেঃ

১. সে সময় একটি গণতান্ত্রিক সরকারকে অস্ত্রের মুখে সরিয়ে দিয়ে সামরিক শাসন জারি করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার অযুহাত হিসাবে রাজনীতিকদের দুর্নীতি ও অযোগ্যতাকে দায়ী করা হয়েছিল। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে যিনি ক্ষমতা দখল করেছিলেন, তাঁর দুর্নীতি যে সকল মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দুর্নীতির অভিযোগে যে সকল রাজনীতিক, আমলা ও ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, তাদের একটি বিরাট অংশ পরবর্তীতে তার দল ও মন্ত্রীসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন।

২. এরশাদ স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন যে রাজনীতি করার তার কোন ইচ্ছা নেই, তিনি কেবলমাত্র দেশের ক্রান্তিলগ্নে দেশের রাজনীতির রোগ সারাতে এসেছেন। তিনি বলেছিলেন যে নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করে নির্বাচন দিয়ে তিনি তার স্থানে ফিরে যাবেন। রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পিছনে তার কোন ব্যক্তিগত লাভ ছিল না, বরং দেশের কথা চিন্তা করেই তিনি এই অতি পরিশ্রমের কাজটি নিয়েছিলেন। তিনি তার কথা কতটুকু রেখেছিলেন তা সকলেরই জানা আছে।

৩. এরশাদ স্বীকার করেছিল যে বিচারপতি সাত্তারকে রাষ্ট্রপ্রতি নির্বাচনের ব্যাপারে তার মূখ্য ভূমিকা ছিল। কিন্তু তিনি তাকে সরিয়ে সময় সুযোগমত ক্ষমতা দখল করেছিলেন কেননা, তাঁর মতে তিনি (বিচরাপতি সাত্তার) সম্মানীয় ব্যক্তি হলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলেন না। বর্তমানের তত্বাবধায়ক সরকারও তো অনেক সম্মানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত। তাদেরকে ক্ষমতাশীন করতে যে এরশাদের উত্তরসূরীরাই মূখ্য ভূমিকা পালন করেছেন সে বিষয়টি নিয়েও এখন তারা আর রাখঢাক করছেন না। তাহলে কি শীঘ্র এমন একটি অবস্থা সৃষ্টি হতে যাচ্ছে যখন বর্তমানের সম্মানীয় দৃশ্যমান ক্ষমতাশীন ব্যাক্তিবর্গ পরিস্থিতি আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না? তাছাড়া এ প্রশ্নও জাগতে শুরু করেছে যে ২৮ অক্টোবরের নারকীয় হত্যাযজ্ঞের সময় পুলিশের অবিশ্বাস্য রকমের রহস্যজনক নীরবতার পিছনে কি অন্য কোন বিষয় ছিল? তার সাথে সে সময়কার পুলিশের আইজির বর্তমানে উপদেষ্টা হবার কি কোন সম্পর্ক রয়েছে? গ্রীষ্ম মৌসুমে বিদ্যূৎ সংকট, তেলের দাম বৃদ্ধির মাধ্যমে দ্রব্যমূল্যে (সিন্ডিকেট ভেঙ্গে ফেলার দাবীর পরও যার

লাগাম টানার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না) অকল্পনীয় বৃদ্ধি, মজুতদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গিয়ে খাদ্য সংকট সৃষ্টি ইত্যাদির মাধ্যমে কি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে ঠেলে দেয়ার কাজ চলছে?

৪. রাষ্ট্র পরিচালনায় সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণের প্রাতিষ্ঠানিক নিশ্চয়তা বিধানের বিষয়ে বিচিত্রার প্রশ্নের জবাবে এরশাদ বলেছিলেন যে সেনা সদস্যরা এ দেশেরই নাগরিক। এটি একটি স্বাধীন দেশের সেনাবাহিনী। তারা তাদের দেশের ঘটনাপ্রবাহ থেকে দূরে থাকতে পারে না। তিনি বলেছিলেন, 'রাষ্ট্র পরিচালনায় সেনাবাহিনী সহযোগী ভূমিকা পালন করবে। যেখানে বিভিন্ন উন্নয়ন কাজে, প্রশাসনে সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণ হবে প্রাতিষ্ঠানিক।' একই কথা বর্তমানে সুশীল সমাজের স্বঘোষিত প্রতিনিধিগণ বলা শুরু করেছেন। কৌতুহলের বিষয় হচ্ছে, যারা এখন সেনাবাহিনীকে সবকিছুর মধ্যেই জড়াতে চাচ্ছেন তারা বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর প্রয়োজন আছে বলেই স্বীকার করতে না। কি এমন ঘটলো যে অপ্রয়োজনীয় সেনাবাহিনী হঠাৎ সর্বরোগের মহৌষধে পরিণত হলো? নাকি সেনাবাহিনীকে রাজনীতিতে টেনে এনে, জনগণের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাড় করিয়ে এবং তাদের মধ্যে দলাদলি ও কোন্দল বাধিয়ে সেনাবাহিনীকে দুর্বল করে ধ্বংস করার খেলা তারা খেলতে চাচ্ছেন?

৪. বিচিত্রার উক্ত সাক্ষাৎকারটিতে যেভাবে ভূমিকা লেখা হয়েছে এবং এরশাদকে যেসব প্রশ্ন করা হয়েছে তাতে সামরিক জান্তার প্রতি পত্রিকাটির গদগদভাব খুব নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। সে সময় সাপ্তাহিক বিচিত্রা ছিল প্রগতিশীলদের সবথেকে শক্তিশালী মুখপত্র। বর্তমান সময়ে যে সকল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া প্রগতিশীলদের সবথেকে বড় মুখপত্র হিসাবে দাবী করে তাদের ভূমিকার সাথে সাপ্তাহিক বিচিত্রার ভূমিকা কি হুবহু মিলে যায় না?

সবকিছুই যখন ২৫ বছর আগের ঘটনাবলীর সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে তখন কি পরবর্তী ঘটনাবলীও সেভাবেই ঘটতে যাচ্ছে? তাহলে বাংলাদেশকে কি তার ২৫ বছরের কক্ষপথের উত্তর প্রান্ত থেকে আবার যাত্রা শুরু করতে হবে? নাগরিকগণকে এখনই বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে।